জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস ISSN 2519-5816
ভলিউম-১৫, সংখ্যা-১ DOI : https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.87698
জানুয়ারি-জুন ২০২৫ Page: 65-74

শ্যামাসংগীতের ভক্তিসুধায় কাজী নজরুল ইসলাম

আশা সরকার*

Abstract

Kazi Nazrul Islam is one of the legendary writers in Bengali literature and music as well as cultural arena. His creative and exceptional merit enriches Bengali literature and music. He was totally free from orthodoxy and narrowness by his merit and wisdom that made him a poet of mass people and humanity. He composed a lot of lyrical music that was full of love, affection, emotion as well as rebellion to the authoritarianism. He also composed a lot of Hindu devotional songs on goddess Kali without considering his religion, race and community. In these devotional songs goddess Kali was emerged somewhere as affectionate mother or daughter else somewhere as homeland on divine feminine energy. Nazrul was highly inspired in this genre named Shyama Sangeet by Ramprasad Sen, a devoted Shakta poet to address Kali with such intimate devotion. Furthermore, the then anti-British nationalistic sense of people simultaneously reached the Nazrul's Shyama Sangeet in highest peak. The diversity, variety and eternal beauty of Shyama Sangeet is revealed in this journal in an aesthetic way. Through textual analysis and comparative research methodology, this research manifests of Kazi Nazrul Islam's simple and rhythmical thought and creation of Shyama Sangeet.

মুখ্যশব্দ: কাজী নজরুল ইসলাম, শ্যামাসংগীত, ভক্তিসুধা, শাক্তধর্ম, অসাম্প্রদায়িকতা

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য ও সংগীত তথা সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম এক প্রবাদপ্রতিম পুরুষ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তাঁর রচনার স্বকীয়তা বাংলা গানের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছে, করেছে শিল্পরস সমৃদ্ধ। তিনি এমন এক সৃজনশীল, মৌলিক, ব্যতিক্রমী প্রতিভা যাঁর যাদুকরী স্পর্শে সাহিত্য, সংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। মেধা, প্রজ্ঞা ও মননশীলতায় সমস্ত হীনতা, নীচতা, সংকীর্ণতা বর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন গণমানুষের কবি, মানবতার কবি। মা, মাটি, প্রেম, দ্রোহ প্রমুখ অনুষঙ্গে একদিকে যেমন অসংখ্য ভাবসংগীত রচনা করেছেন তেমনি জাত-পাত, সমস্ত কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে রচনা করেছেন ভক্তি সুধামৃত শ্যামাসংগীত। মুসলিম হয়েও সনাতন এবং অন্যান্য ধর্মের সমস্ত অনুষঙ্গকে যেভাবে সংগীতময়তার প্রবাহে উপস্থাপন করেছেন তা এক অবিনাশী সৃষ্টি। নজরুলের শ্যামাসংগীতগুলো যেন অবারিত মরুর বুকে এক ফোঁটা জলের তৃষ্ণা মিটিয়েছিল। নজরুলের শ্যামাসংগীত বাংলা কাব্যসংগীতের ধারায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য তাঁর গানের বাণীর সঙ্গে সুরের অপূর্ব সমন্বয়ের ফল। স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিদ্রোহী নজরুলের গানে শ্যামা কখনও স্নেহময়ী মা, কখনও কন্যা, কখনও দেশমাতৃকা আবার কখনও মঙ্গলময়ী রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। রামপ্রসাদের ভক্তিরস বিগলিত শ্যামাসংগীত আর সাথে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী ও বিদ্রোহী চেতনা এই দুইয়ের সমন্বয়ে নজরুল শ্যামাসংগীতকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। নজরুলের শ্যামাসংগীতের ব্যাপকতা, শ্যামাসংগীত রচনার অন্তরালে নজরুলের চিন্তা-চেতনা, সর্বোপরি শ্যামাকে বিভিন্ন সাংগীতিক আঙ্গিকে রূপদানের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। সমসাময়িক সাংগীতিক ধারাকে আত্মস্থ করে সুর ও বাণীর মালায় সহজ, সরল, ছন্দোবদ্ধভাবে শ্যামাসংগীতকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তা আলোচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি জাত, পাত, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের। নজরুলের চিন্তা-চেতনা এবং সৃষ্টিকর্মে সকল ধরনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা লক্ষ করা যায়। মানবতা, শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে সকল মত, পথের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধার ব্যাপারটি নজরুলের গানের সাথে আত্মীকৃত এবং গভীরভাবে সম্পর্কিত। নজরুল মনে-প্রাণে ধারণ করতেন, অসাম্প্রদায়িকতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং সকল ধর্মমতকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা করা। ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়েও সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য, মিথ, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণ, পুরাণ, রামায়ণ, বেদ, গীতা, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মীয় ও পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ ও অনুধাবন করেছেন নজরুল এবং এসব উৎসকে অকৃপণভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনায়। এই গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো, শ্যামাসংগীতের প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের অনুরক্তি ও গভীর প্রজ্ঞাবোধের সন্নিবেশ নিরূপণ করা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য হলো, শ্যামাসংগীতের প্রতি নজরুলের গভীর অনুভব এবং অন্তঃস্থ ভক্তিমার্গের স্বরূপ উদঘাটন করা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণা। পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। নজরুলের শ্যামাসংগীতের সম্ভার থেকে শ্রেণিকরণ অনুযায়ী স্বল্প কিছু গান এখানে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই, জার্নাল, স্মরণিকা, প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণার তাৎপর্য

নজরুলের শ্যামাসংগীত নিয়ে বিস্তৃতভাবে কাজের সুযোগ রয়েছে। একদিকে পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় মিথের চমৎকার উপস্থাপন অন্যদিকে অস্প্রাদায়িক বাতাবরণ তৈরি- এ দু'য়ের সমন্বয় অত্যন্ত নান্দনিকতার সাথে নজরুল শ্যামাসংগীতে দেখিয়েছেন। উক্ত গবেষণাকর্মটি শ্যামাসংগীতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ক অন্যান্য গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আশা করি।

নজরুলের শ্যামাসংগীত

কাজী নজরুল ইসলামের অধ্যাত্ম ধারার গানগুলির প্রায় সবই যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি রসোত্তীর্ণ। তাঁর রচিত শ্যামাসংগীতগুলো এই ধারারই অনন্যকীর্তি। শ্যামাসংগীত বাংলা গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শ্যামাসংগীতের ধারাটি বিকাশলাভ করে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। হিন্দুধর্মের একটি শাখা শাক্তধর্ম[১] বা শক্তিবাদের অনুসারী। মাতৃশক্তি বা দেবী পরম ও সর্বোচ্চ সম্মান এবং শক্তির অধিকারী- এই মতবাদের ভিত্তিতে শাক্তধর্মের উদ্ভব।' মঙ্গলকাব্যের আখ্যানগীতির ধারা ক্ষয় হয়ে আসলে এই পদসংগীতের ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।[২] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে* গ্রন্থে বলেছেন-

> পূর্ণিমা-প্রভাতে যেমন ম্লানায়মান চন্দ্রমন্ডলের চারিদিকে উদয়োন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ বাঙলার সাহিত্যাকাশে বৈষ্ণবকবিতার পূর্ণচন্দ্র অস্তাচলে হেলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শাক্তসাধনার সৌরকরজাল প্রখর হইয়া উঠিল। বাংলা সাহিত্যে শক্তিকেন্দ্র ও প্রাণস্পন্দনের আধার স্থানান্তরিত হইল। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত ও বিক্ষিপ্ত ধারাগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রামপ্রসাদের সাধনায় ও গানে।[৩]

-এ শাক্তদর্শন নজরুলকে আলোড়িত করেছিল এবং শ্যামাসংগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি- এমন এক উত্তাল, অসহায় সময়ে ভাষাকে নজরুল প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এসময় শাক্তদর্শন নজরুলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। শক্তিদেবী শ্যামা বা কালী এবং উমা বিষয়ক গানকে শ্যামাসংগীত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শ্যামাবন্দনা বা শ্যামাদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গানগুলোকে শ্যামাসংগীত বলা হয়। এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায়, অ্যান্টনি কবিয়াল প্রমুখ পদকর্তাদের ভূমিকা ছিল কিংবদন্তিস্বরূপ। বলা হয়ে থাকে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পর কাজী নজরুল ইসলামের মতো এত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী শ্যামাসংগীত আর কেউ রচনা করতে পারেননি। তবে শ্যামাসংগীত প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদ সেনের গানের কথা না বললেই নয়। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল শক্তি সাধনাকে নিরস শাস্ত্রাচার ও তান্ত্রিকতা মুক্ত করে একটি সহজ, আবেদন পূর্ণ সাংগীতিক রূপ দান করা। জীবনের সমস্ত জটিলতার পেছনে এক মায়াময়ীর রহস্যজাল বিস্তারের সহজ, সরল অনুভূতি যেন ব্যক্ত হয়েছে রামপ্রসাদের গানে। তাঁর রচিত 'মন রে কৃষিকাজ জান না', 'কালী নামে দেওরে বেড়া', 'কালী কালী বল রসনা', 'হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা' ইত্যাদি গান এক সময় শ্যামার আরাধনা সংগীত হিসেবে গীত হতো। এছাড়া কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'শ্যামা মা কি আমার কালো' 'আর কিছু নাই শ্যামা তোমার', 'সদানন্দময়ী কালী', 'শ্যামাধন কি সবাই পায়' ইত্যাদি গানগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে নজরুল শ্যামাসংগীত রচনার পর রামপ্রসাদী শ্যামাসংগীতের পাশাপাশি তাঁর গানও সমাদৃত হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে দাশরথি রায়, রসিক রায়, কালী মির্জা, রঘুনাথ রায় প্রমুখ সংগীত

রচয়িতাদের অবদানে শ্যামাসংগীতের ধারা পরিপুষ্টতা লাভ করে। কাজী নজরুল ইসলাম এ ধারায় রাগরাগিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এনেছেন বৈচিত্র্যময়তা। এ প্রসঙ্গে ড. বাঁধন সেনগুপ্ত বলেন-

> রামপ্রসাদ পরবর্তীকালে যারা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের রচনায় উমার প্রভাবই অধিক কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রধানত নজরুলের রচনাতেই শ্যামাসঙ্গীতের সার্থক রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কারণে নজরুল রচিত শ্যামাসঙ্গীতকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা চলে। প্রথমত ইতিপূর্বে কোন মুসলিম কবির রচনায় এমন সার্থক শ্যামাসঙ্গীত অন্তর্ভূক্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত কবির সমসাময়িক কবিদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই এত সঠিক সংখ্যক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।[৪]

ড. করুণাময় গোস্বামী রচিত *বাংলা গানের বিবর্তন* বইয়ের মাধ্যমে জানা যায়- শ্যামাসংগীতের অপর নাম শাক্তসংগীত। তাই বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম শক্তিরূপিণী দেবীবন্দনামূলক শাক্তসংগীত রচনার মধ্য দিয়ে দেবীকে গণমানুষের কাছে আরাধ্য করে তুলেছেন। শ্যামাসংগীতে নজরুলের অবদান সম্পর্কে ড. করুণাময় গোস্বামী বলেছেন-

> শ্যামাসংগীত রচয়িতারূপে রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সাংগীতিক নান্দনিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, নজরুল তদপেক্ষা উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন; কেননা, কবি ও সুরস্রষ্টারূপে তিনি পূর্ববর্তী সংগীত রচয়িতাদের চেয়ে মহৎ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে পরিচয় তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে রেখেছেন তার গানে।[৫]

নজরুলের লেখনীতে এবং সুরের সাবলীলতায় শ্যামাসংগীতের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্য ও রাগের সমন্বয় করে নজরুল এ সংগীতকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছেন। শক্তিদেবী কালীর মহিমা প্রচারে একদিকে যেমন মহাকালীকে রণরঙ্গিনী, ভয়ঙ্করী মূর্তিতে আবাহন করেছেন, অন্যদিকে তাকেই স্নেহময়ী জগৎ জননী, প্রেমময়ী মূর্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন যে কালী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ই কালী– একে উপজীব্য করে নজরুল কালী আর রাসবিহারী শ্যামে কোনো তফাৎ দেখেননি।

নজরুলের শ্যামাসংগীত শৈল্পিক পর্যায়ে এক অনন্য উচ্চতার দাবি রাখে। তাঁর গানের মধ্যে শ্যামার বহুবর্ণিল, মনোহর রূপের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। শ্যামাকে তিনি নিজের মতো করে, নিজস্ব দর্শন দিয়ে বিনির্মাণ করেছেন। প্রার্থনার জন্য তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ না করে সৃজন করেছেন নিজস্ব ভাষা। নজরুলের এই ভক্তি ও প্রেম রস মিশ্রিত শ্যামাসংগীত বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় নজরুলের জ্ঞানের গভীরতা কতটা দৃঢ় ছিল শ্যামা সম্পর্কে।

'কালী' শব্দটি 'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ যার অর্থ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। 'কাল' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে– নির্ধারিত সময় এবং প্রসঙ্গক্রমে তা মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক টমাস কর্বানের মতে, কালী শব্দটি নাম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে আবার কৃষ্ণবর্ণা বোঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে। প্রকৃতঅর্থে কাল বা সময়কে যিনি রচনা করেন তিনি কালী। আবার শ্রী শ্রী চণ্ডীতে পাওয়া যায়–

> জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালীনি
> দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে।[৬]

অর্থাৎ দেবীকে এখানে সর্বোৎকৃষ্টা, মোক্ষপ্রদায়িনী, সর্ব্বসংহারিণী, ভক্তমঙ্গলদায়িণী রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কালীকে বলা হয়েছে হে দেবী তুমিই দুর্গা, শিবা অর্থাৎ চৈতন্যময়ী, দয়াময়ী, বিশ্বধারণকারিণী, তুমিই স্বাহা ও স্বধা অর্থাৎ দেবগণ ও পিতৃগণের পোষণকারিণী।

পরবর্তীকালে ধর্মীয় সমন্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা ও চালিকা শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কালী বা আদ্যাশক্তি মহামায়া সম্পর্কে বলেন–

> তিনি মহামায়া, জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন আবার সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিসই কেবল দেখা যায়– সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। এই আদ্যাশক্তির মাঝেই বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে।[৭]

কালী, শ্যামা বা আদ্যাশক্তি সম্পর্কে এই নিগূঢ় জ্ঞান কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অন্তর্চক্ষু এবং গভীর প্রজ্ঞাবোধ দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রজ্ঞাবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত শ্যামাসংগীতগুলোর মাঝে। এমন ভক্তিমিশ্রিত ভালোবাসার প্রকাশ যেন ভক্ত নজরুলের পক্ষেই সম্ভব। নজরুলের শ্যামাসংগীত বিশ্লেষণ করলে শ্যামাভক্তির তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়[৮]-

- আত্মজারূপী শ্যামা
- মাতৃরূপী শ্যামা
- মঙ্গলময়ী শ্যামা

আত্মজারূপী শ্যামা

নজরুলের শ্যামাসংগীতের মধ্যে আত্মজারূপী শ্যামার রূপটি ভীষণ স্নিগ্ধ, মনোমুগ্ধকর, যেখানে শ্যামা সরলতা, বিশালতার উপমায় উপমিত। শ্মশানময়ীর সেই করালবদনী, ভয়ংকর রূপ তার নেই। বিনিময়ে আছে এক মায়াবী, আদরিণী, প্রাণ মাতানো গ্রামীণ বালিকার আনাগোনা। আত্মজাকে শতরূপে, শতবর্ণে আদরণীয় ও স্নেহময়ী করে তোলা যায়; মান– অভিমান মুগ্ধতায় আলিঙ্গন করা যায়, তার বর্ণিল প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের শ্যামাসংগীতে। যেমন-

> আদরিণী মোর কালো মেয়ে রে কেমনে কোথায় রাখি
> তারে রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে বুকে রাখিলে
> দুখে ঝুরে আঁখি ॥[৯]

উক্ত গানে কাজী নজরুল ইসলাম যেন আদরিণী এবং বহু প্রতীক্ষিত এক কিশোরী বালিকার কল্পরূপ অঙ্কন করেছেন। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এ কিশোরীকে যেন কাঙালের ধনের মত আগলে রাখতে চান তিনি, বেঁধে রাখতে চান হৃদমাঝারে। দুরন্ত এ নির্ঝরিণীকে আকুল হয়ে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। নজরুল শ্যামাকে ঘরের মায়াবী, আদুরে মেয়ে হিসেবে যে পার্থিব রূপ দান করেছেন তা অতুলনীয়। দেবী নয় বরং তপ্ত, মধুর অভিমানিনী, দয়াময়ী মেয়ে হয়ে কবির গানে প্রকাশ পেয়েছে। শ্যামা রাগ, দুঃখ, অভিমানে সিক্ত হন আবার লাজে রাঙা হয়ে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল লিখেছেন-

> আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে (মাকে) কে দিয়েছে গালি
> রাগ ক'রে সে সারাগায়ে মেখেছে তাই কালি ॥[১০]

কন্যারূপী শ্যামা আপন মনে ছুটে বেড়ায়। মনের কোণে খুশির সঞ্চারণ ঘটলে আপন ছন্দে নৃত্য করেণ। আবার তাঁর রূপের ছটায় মহাকাল শিব বুক পেতে দেন। শ্যামার ভুবনমোহিনী আলো করা কালো রূপের মধুরতম প্রকাশ ঘটেছে গানের বাণীতে-

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন
(তার) রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন ॥[১১]

একইভাবে শ্যামা যখন পাষাণী হয়ে ওঠেন, সেই পাষাণীর পাষাণ হৃদয় গলাতে, একটু মমতা পেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ভক্ত নজরুল। শোকের ঘোর শ্মশানে বসেও কালী মন্ত্র জপে মনে শান্তি সঞ্চারণ করেন। একাগ্রচিত্তে গানের মধ্য দিয়ে নিজেকে সমর্পিত করেন মায়ের চরণে-

পাষাণী মেয়ে! আয়, আয় বুকে আয়
জগত জননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায়
রাজার দুলালী কোন অভিমানে ভিখারিণী হয়ে বেড়াস শ্মশানে
ত্রিলোকের যত পতিত অধমে ঠাঁই দিয়েছিস পায় ॥[১২]

মাতৃরূপী শ্যামা

মাতৃরূপী শ্যামা যেন স্নেহময়ী, মমতাময়ী পার্থিব মায়েরই বহিঃপ্রকাশ। শ্যামার মাতৃরূপের মধ্যে দু'টি রূপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক রূপের মধ্যে নজরুল নিজেই প্রার্থনারত হয়েছেন নিজের মুক্তির জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য- যেখানে মান, অভিমান, ভালোবাসা, বিরহ, যুক্তিতর্ক সব আছে যেমনটি থাকে মায়ের প্রতি সন্তানের। তাই শ্যামা মা'কে পেতে দেন হৃদয়ের আসন। অন্যদিকে শ্যামার মাতৃরূপের আরেকটি দিক সর্বজনীন, যেখানে তিনি কারো একার মা নন, তিনি জগৎজননী, বিশ্বজননী। বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা সর্বত্র-এই ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে নজরুলের গানে। মহাবিশ্বের সবকিছুই সেই মহামায়ার নিয়ন্ত্রণে। গানের বাণীতে উঠে এসেছে-

আমায় যারা দেয় মা ব্যথা আমায় যারা আঘাত করে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী!
আমায় যারা ভালবেসে বন্ধু ব'লে বক্ষে ধরে,
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী ॥[১৩]

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যখন অন্যের প্রতি কঠোর ভাষার আঘাত ব্যক্ত হয় তখনও নিজের নিয়ন্ত্রণে নজরুল শ্যামার মাঝে স্নেহময়ী মাকে খোঁজেন। দহন, দুঃখ, ক্লেশ, আমিত্ব ভাবের মুক্তি সবই কবি ব্যক্ত করেছেন গানের বাণীতে-

আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ আজও মুক্তি নহি
আজও অন্যে আঘাত দিলে কঠোর ভাষা কহি
মোর আচরণ, আমার কথা, আজও অন্যে দেয় মা ব্যথা
আজও আমার দাহন দিয়ে শত জনে দহি ॥[১৪]

গানটির সঞ্চারী অংশের বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে-

শত্রুমিত্র মন্দভালোর যায়নি আজও ভেদ
কেহ ব্যথা দিলে, প্রাণে আজও জাগে খেদ
আজও মাগো দুঃখে শোকে অশ্রু ঝরে আমার চোখে
আমার আমার ভাব ওগো মা
আজও জাগে রহি রহি ॥[১৫]

উপরোক্ত গানে নজরুল যেন জগজ্জননী মায়ের কাছে সকল অনুভূতি আর অনুভবের ডালি নিয়ে আসন পেতে বসেছেন।

কবি আনন্দ, অশ্রু সমস্ত কিছু মায়ের পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করে মাকে পেতে দেন হৃদয়ের আসন। আত্ম-সুখ, ঐশ্বর্য নিয়ে যখন সকলে মত্ত, নজরুল তখন বিশ্বজননীর কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য, ষড়রিপু বিসর্জন দিয়ে মানবের মুক্তির প্রার্থনা করেছেন। নজরুল গানের বাণীতে ব্যক্ত করেছেন-

আমার হৃদয় হবে রাঙা জবা দেহ বিল্বদল
মুক্তি পাবো ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল
মোর বলির পশু হবে সর্বকাম, মোর পূজার মন্ত্র হবে মায়ের নাম
মোর অশ্রু দেবো মা'র চরণে সেই তো গঙ্গাজল ॥[১৬]

আবার নজরুল গানে গানে ব্যক্ত করেছেন-

কে বলে মোর মাকে কালো, মা যে আমার জ্যোতির্মতী
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা নিত্য করে যার আরতি ॥[১৭]

নজরুল মাতৃরূপী শ্যামার মাধ্যমে সন্তানের সাথে মায়ের মান-অভিমান, আদর-ভালোবাসাময় বহু দিকের উন্মোচন করেছেন। বিশ্বের প্রতিটি ধ্বনি, প্রাণের অনুরণনে মায়ের অস্তিত্বের বার্তা নজরুল গানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই রূপের মধ্য দিয়ে সকল শুভ, সুন্দর, কল্যাণের সে ভাব ব্যক্ত করেছেন গানে গানে-

মাগো তোরি পায়ের নূপুর বাজে এই বিশ্বের সকল ধ্বনির মাঝে
জীবের ভাষায় পাখির মধুর গানে, সাগর রোলে নদীর কলতানে
সমীরণের মরমরে শুনি সকাল সাঁঝে ॥[১৮]

মঙ্গলময়ী শ্যামা

শ্যামা মায়ের আরেকটি রূপ সমস্ত অশুভ এবং অকল্যাণের বিরুদ্ধে। শুভঙ্করী শ্যামা, মঙ্গলময়ী শ্যামা সকলের বিপদে আপদে কোল পেতে দেন। কবি শ্যামার অশিবনাশিনী, মঙ্গলময়ী, অসুর বিনাশিনী রূপের উদ্বোধন কামনা করেছেন এভাবে-

জ্বালো দেয়ালী জ্বালো
অসীম তিমিরে শ্যামা মা যে অযুত কোটি আলো ॥[১৯]

আবার নজরুল লিখেছেন-

এলো শক্তি অশিবনাশিনী
এলো অভয়া চির বিজয়িনী
কালো রূপের স্নিগ্ধ লাবনি নয়ন মন জুড়ালো ॥[২০]

–এ গানে নজরুল যেন অসীম আঁধার মাঝে আলোকবর্তিকা হাতে শ্যামা মায়ের এক চমৎকার চিত্রকল্প এঁকেছেন। সকল জরা, ব্যাধি, তমসা, অশুভকে বিনাশ করতে এবং সকলের জীবনকে দীপাবলির শুভ্র আলোকে আলোকিত করতে শুভশক্তির প্রকাশ হিসেবে কবি এখানে শ্যামা মায়ের এক স্নিগ্ধ, লাবণ্যময়ী রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

অসীম তিমিরে আসন্ন প্রলয়ে অশুভনাশিনী শ্যামাকে নজরুল খুঁজেছেন গানের মাধ্যমে। দশ হাতে সমস্ত আঘাতকে বিদীর্ণ করে আর্ত জনে সত্য, সুন্দরের অভয় বাণী শোনাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন শ্যামাকে। যোগনিদ্রা ভঙ্গ করে মহামায়াকে জাগ্রত করার মাধ্যমে সাত্ত্বিক, রাজসিক দুই মহা দেবতার রক্ষার্থে প্রার্থনারত হয়েছেন নিম্নোক্ত গানের বাণীতে–

জয় মহাকালী, জয় মধু কৈটভ বিনাশিনী
জয় যোগনিদ্রা জয় মহামায়া ধর্ম প্রদায়িণী
ভয়াতুর ব্রহ্মা অসুর-আশঙ্কায় বিষ্ণু নিদ্রাতুর তোমার মায়ায়
রাজসিক সাত্ত্বিক দুই মহা দেবতায় রক্ষা কর মা
তুমি মহাভয় হারিণী ॥[২১]

নজরুল রচিত শ্যামাসংগীতের সংখ্যা প্রায় ১৪০টি, তন্মধ্যে ১০০টি শ্যামাসংগীত নিয়ে প্রকাশিত হয় *রাঙা-জবা* গ্রন্থ। অন্তরে ভক্তি ও আধ্যাত্মের জাগরণ না ঘটলে সুর ও বাণীর এমন চমৎকার বিশ্লেষণ ঘটানো সম্ভব নয়। যদিও নজরুলকে সাম্প্রদায়িকতার নষ্ট রশিতে বাঁধার অপচেষ্টা করা হয়েছে, এমনকি কাফের বা বিজাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু নজরুল নিজ সত্যে অটল ছিলেন। তাঁর ভাষায়-

> আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তাঁর জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্য দ্রষ্টা ঋষির আত্মা।[২২]

নজরুলের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রত্যয়, প্রতিশ্রুতি, ব্যক্তি মানস এবং শিল্পী মানসে কখনও কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-স্ববিরোধ চোখে পড়ে না। নজরুল ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থার উন্নয়নে, সমস্ত কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা এবং গোড়ামির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। এমনকি কারাবরণ করতেও পিছপা হননি। উত্তাল ভারতবর্ষে নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে', 'বিদ্রোহী' বা 'ধুমকেতু'র মত রক্ত গরম করা লেখা ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল যা অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিকের জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল। নজরুলের এই মুক্ত মন, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনোজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শ্যামাসংগীত রচনা সেই আলোড়নের এক স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তাই নজরুল-জীবন ও নজরুল-সৃষ্টির একত্র নাম হতে পারে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিসাধনা।[২৩]

শ্যামাসংগীতের সুর

নজরুলের গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যপূর্ণ বাণী ও সুর সমাহার। কথার মালায় সুরের গাঁথুনির চমৎকার সমন্বয় নজরুলের গান। শ্যামাসংগীতের ক্ষেত্রেও নজরুল বাণীবাহিত ভাবকে সঙ্গতিপূর্ণ সুরবিহারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুল রামপ্রসাদী সুরের সহজ, সরল আত্মনিবেদন প্রয়োগ করেছেন 'আমার হাতে কালি মুখে কালি'[২৪] গানটিতে যা কীর্তন ও বাউল সুরের মিশেলে ভক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সাধনার অনুভূতি প্রকাশের এক অনবদ্য সংমিশ্রণ। নজরুল শ্যামাসংগীতে কীর্তনের পাশাপাশি লোকসুরের উপাদানও ব্যবহার করেছেন যা গানগুলোকে সহজবোধ্য করে

তুলেছে। এছাড়াও নজরুলের শ্যামাসংগীতে খেয়াল ও ঠুমরি প্রভাবিত সংগীতশৈলীর ব্যবহার লক্ষণীয়। বলা যায়, নজরুলের শ্যামাসংগীতের সুর কেবল একটি সাঙ্গীতিক ধারা নয় বরং এক গভীর আধ্যাত্মিক ও আবেগিক প্রয়োগ যা সুরের মধ্যে এক অসীম স্নিগ্ধতা ও তীব্রতা ছড়িয়েছে।

উপসংহার

অব্যক্ত কথা বা জীবনবোধ যখন শিল্পীর সৃজনশীল কলমের আচঁড়ে ব্যক্ত করা হয়, তা অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। নজরুলের শ্যামাসংগীত ঠিক তেমন কিছু অব্যক্ত কথার ব্যক্ত প্রতিধ্বনি। পৌরাণিক কাহিনি, ধর্মীয় বাতাবরণ, দর্শন, মূল্যবোধ সমস্ত কিছুর সামগ্রিক প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের শ্যামাসংগীতে। নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারায় শাশ্বত ধর্মবিশ্বাস ছিল না কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিকের চেয়েও গভীর একাগ্রতা রয়েছে তাঁর এসব গানে[২৫]। নজরুলের শ্যামাসংগীত অনুধাবনের প্রধান মাধ্যম হলো তাঁর গানের বাণী বিশ্লেষণ করা, সুরের গভীরতা নিরূপণ করা। শ্যামাকে কতখানি 'আপনার চেয়ে আপন' ভাবতে পারলে এমন ভাবনা, এমন বাণীর উদ্‌গীরণ ঘটানো যায় এবং বিগলিত সুররসে সিক্ত করা যায় এর সুন্দরতম উদাহরণ নজরুল। কাজী আবদুল ওদুদ নজরুলের এ গানগুলো সম্পর্কে বলেন-

> ইসলামি সঙ্গীতের চাইতে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় নজরুল সার্থকতা অর্জন করেছেন অনেক বেশি। বাংলার শ্যামাসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবের বস্তু, বিশেষ করে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত। কিন্তু বাংলার প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে একটি বিশিষ্টতা ফুটেছে।[২৬]

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে নজরুলকে নিয়ে সমালোচনা এবং কিছু সংখ্যক মুসলমানের অভিযোগের কারণ ছিল নজরুলের শ্যামাসংগীত। কিন্ত নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন না দিয়ে বরং সকল মত ও পথের প্রতি আন্তরিক এবং শ্রদ্ধাভাজন হয়ে এক সর্বশক্তিমান পরম ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা দ্বারা। শুধু শব্দের সমন্বয় নয়, এ এক চেতনার সমন্বয়। নজরুল তাঁর জীবনের দীনতা, হীনতা, ছন্দপতনে এক এবং অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন বহুভাবে। তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছেন আল্লাহ, ভগবান, শ্যামা, শিব, কৃষ্ণ, প্রভু সবই পরম শক্তির প্রকাশ। এ ধর্মদর্শন ও গভীর জীবনবোধের সহজ, সরল, প্রাণবন্ত উপস্থাপনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শ্যামাসংগীতে। একাগ্রচিত্তে শ্যামাসংগীত রচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন শ্যামার পাদপদ্মে, ভক্তিসুধায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ভক্ত নজরুল। নজরুলের গানের এক বিশাল জায়গা জুড়ে তাঁর এই দর্শনবোধ ব্যক্ত হয়েছে যা তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে, করেছে অনন্য। তীব্র ভক্তি আর বাৎসল্য রসে হৃদয় সিক্ত না হলে এমন শ্যামাসংগীত রচনা অসম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১. অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), *শাক্তপদাবলী (চয়ন)*, (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, একাদশ সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ১০

২. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৯৩

৩. তদেব

৪. ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, আব্দুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত), *নজরুল গীতি অখণ্ড*, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৮), পৃ. ৩৫

৫. ড. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ২৫৩

৬. সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *শ্রী শ্রী চণ্ডী*, (কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর), পৃ. ২২-২৩

৭. শ্রী'ম'কথিত, *শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত*, (কলকাতা: কম্পুকলার, ১৯৮৩), পৃ. ১২৪
৮. সাকার মুস্তাফা, *নজরুলের শ্যামাসাধনা ও শ্যামাসঙ্গীত*, (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৯), পৃ. ৩৭
৯. রশিদুন্ নবী (সম্পাদিত) *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৬), পৃ. ৩২২
১০. তদেব, পৃ. ২০৬
১১. তদেব, পৃ. ২৭৪
১২. তদেব, পৃ. ৫৯৯
১৩. তদেব, পৃ. ২০৬
১৪. তদেব, পৃ. ৩১৬
১৫. তদেব
১৬. তদেব, পৃ. ২৩২
১৭. তদেব, পৃ. ৩৭০
১৮. তদেব, পৃ. ৬২৫
১৯. তদেব, পৃ. ১১৭
২০. তদেব
২১. তদেব, পৃ. ৫৭০
২২. কাজী নজরুল ইসলাম, *'রাজবন্দীর জবানবন্দী'*, *নজরুল রচনাবলী* ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৬), পৃ. ৪৩৩-৪৩৪
২৩. সৌমিত্র শেখর, *নজরুল: আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এবং শিল্পীর বোধ*, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৩), পৃ. ৩৩
২৪. রশিদুন্ নবী (সম্পাদিত) *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
২৫. তাহা ইয়াসিন, *নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারা*, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৩), পৃ. ৩৯০
২৬. তদেব, পৃ. ৩৯৭